## রাজ্যসভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে কোণঠাসা বামেরা

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে কংগ্রেস শীর্ষনেতা মনু সিংভিকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থনের কথা ঘোষণা করায় কোণঠাসা হয়ে পড়ল সিপিএম। মান বাঁচাতে সিপিএম রবীন দেবকে প্রার্থী করলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের ব্যবধান বাড়ল। অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতিতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে শরদ পাওয়ারের দল এনসিপির নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল গুক্রবারই কলকাতায় এসে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে জাতীয় রাজনীতি নিয়ে একান্তে কথা বলেছেন বোঝা যাবে বিজেপি বিরোধী সব দলই কেন্দ্রে বিরোধী জোট গঠনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেত্রীকে পুরোভাগে চান।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সভার আসনে অরাজনৈতিক প্রার্থী দেওয়ার চল ছিল তৃণমূলের, কিন্তু এবার তার পরিবর্তন হল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, ''রাজ্যসভায় এবার দলের কর্মীদের টিকিট'' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। অভিষেক মনু সিংভি রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের প্রার্থী। তিনি কংগ্রেসের সব ভোট পাবেন বলেই আশা, তৃণমূলের বাড়তি ভোটগুলিও পাবেন। সবচেয়ে বেকায়দায় পড়ল সিপিএম, দলের এই পরিণতি ক্যাডারদের কাছে হতাশার।

## অমৃত কথা

**দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ**

রবিবর চৈত্র পূর্ণিমা, দশই বৈশাখ; ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ; বৈকাল বেলা। অনেক ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত; ভক্তেরা ঠাকুরকে ঘিরিয়া দক্ষিণের দালানে বসিলেন। সন্ধ্যার পর আদি সমাজের **আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম** উপাসনা করিবেন।

ব্রহ্মভক্তেরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন।

ব্রাহ্মভক্ত-মহাশয়, উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ-উপায় অনুরাগ,অর্থাৎ তাঁকে ভালোবাসা। আর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মভক্ত - অনুরাগ না প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা।

''ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে''—

শ্রীরামকৃষ্ণ সুর করিয়া এই গানটি গাইলেন।

''আর সর্বদাই তাঁর নামগুণগান , কীর্ত্তণ ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে? আর বিবেক, বৈরাগ্য সংসার অনিত্য, এই বোধ।''

**(ব্রাহ্ম ভক্ত ও সংসার ত্যাগ–সংসারের নিষ্কাম কর্ম)**

ব্রাহ্মভক্ত–সংসার ত্যাগ কি ভাল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ –সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের সংসার ত্যাগ নয়। দুআনা মদে কী মাতাল হয়?

ব্রাহ্ম ভক্ত –তারা তবে সংসার ক'রবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তারা নিষ্কাম কর্ম করবার চেষ্টা করবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গবে। বড়ো মানুষের বড়ির দাসী সব কর্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে ; এরই নাম নিষ্কাম কর্ম।"এরই নাম মনে ত্যাগ। তোমরা মনে ত্যাগ করেবে।সন্ন্যাসী বাহ্যির ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুই করবে।

**(ব্রাহ্মভক্ত ও ভোগান্ত –বিদ্যারুপিণি স্ত্রীর লক্ষণ-বৈরাগ্য কখন হয়)**

ব্রাহ্মভক্ত—ভোগান্ত কীরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ --কামিনি-কাঞ্চন ভোগ। যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা , সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুস্কিল! টাকাকড়ি,মানসম্ভ্রম, দেহসুখ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে --ভোগান্ত না হলে --সকলের ঈশ্বরেরে জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

ব্রাহ্মভক্ত –স্ত্রী জাতি খারাপ,না আমরা খারাপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিদ্যারুপিনী স্ত্রীও আছে,আবার অবিদ্য-রূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারুপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর অবিদ্যারুপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়

''তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ সংসার।এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া অবিদ্যা- মায়া দুই আছে।

## দিনপঞ্জিকা

**২৮ ফাল্গুন**, ভাং ২২ ফাল্গুন, **১৩ মার্চ**, ২৮ ফাগুন, সংবৎ ১১ চৈত্র বদি, ২৪ জমাং সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৫৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৪১। **মঙ্গলবার**, একাদশী দিবা ঘ ১।২৫ মিঃ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৩০ মিঃ। পরিঘযোগ রাত্রি ঘ ৯।৩১ মিঃ। বালবকরণকরণ,দিবা ঘ ১।২৫ গতে কৌলবকরণ,রাত্রি ঘ ২।২১ গতে তৈতিলবকরণ। **জন্মে**—মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী, বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা,দিবা ঘ ১২।৩০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**—ত্রিপাদদোষ, দিবা ঘ ১২।৩০ গতে একপাদদোষ,দিবা ঘ ১।২৫ গতে দ্বিপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৭।২২ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।১৩ গতে ও ৮।৪৪ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**– দ্বাদশীর সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১।২৫ গতে চন্দ্রদ্বাদ্বা। **একাদশীর উপবাস(পাপমোচনী)। গোস্বামিমতে এবং নিম্বার্কসম্প্রদায় মতে অদ্য একাদশীর উপবাস**। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **শ্রীশ্রীমা কমলাদেবীর অর্বিভাব। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর একাদশ দোলোৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে কীর্ত্তন ও ফাগুখেলা।** **অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৮।৩ গতে ১০। ২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৫ গতে ১১।১৭ মধ্যেও ১।৪০ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

**২৮ ফাল্গুন**, ভাং ২২ ফাল্গুন, **১৩ মার্চ**, ২৮ ফাগুন,২৪ জমাং সানি উঃ ৫।৫৩,অঃ ৫।৪১ মঙ্গলবার, একাদশী দিঃ ঘঃ ১।২৫।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# রাজর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

**তপন কান্তি মুখার্জি**
**পর্ব ১**

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র, ছয় কন্যা ও নয় পুত্রের গর্বিত পিতা। বিরাট চেহারা, গায়ের রঙ সাহেবদের মতো, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, চেঁচিয়ে কথা বলা তাঁর না-পসন্দ। বাড়ির লোকজন তাঁর উপস্থিতিতে তটস্থ। অবশ্য বেশিরভাগ সময় তিনি হিমালয় পাহাড়েই অধিষ্ঠান করেন। মাঝে মধ্যে নেমে আসেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। কারও সাথেই তিনি বেশি কথা বলেন না, বাড়ির চাকরবাকর তাঁর সামনে টু শব্দ করতেও ভয় পায়। ছাদের উপর মস্ত এক ঘরে তিনি থাকেন। সংসারের খরচপাতি, হিসেবনিকেশ, জমিদারির দেখভাল সব তাঁরই হাতে। একদিকে তিনি রাজা, অন্যদিকে ঋষি। তাই মহর্ষির থেকেও বোধহয় 'রাজর্ষি'র আখ্যাই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত।

যাই হোক, প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকাতেই হয়। তাই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ ছিলেন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ। ভট্টনারায়ণের অধস্তন পঞ্চবিংশতিতম পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। তিনি অথবা তাঁর পিতা পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারী, যশোহরের চেঙ্গুটিয়ার পিরালি ব্রাহ্মণ শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে পিরালি থাকভুক্ত হন। পুরুষোত্তমের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন দুই ভাই মহেশ্বর ও শুকদেব। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন কুশারীই হলেন ঠাকুরবংশের ইতিহাসসিদ্ধ আদিপুরুষ। পঞ্চানন কুশারী কাকা শুকদেবকে নিয়ে পিঠাভোগ গ্রাম ত্যাগ করে কালীঘাটের নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় গোবিন্দপুর ছিল জেলে, মালো, কৈবর্ত-জাতি অধ্যুষিত গ্রাম। তারা নবাগত ব্রাহ্মণদের প্রথানুযায়ী ঠাকুর বলে ডাকত। তখন থেকেই কুশারীরা হলেন ঠাকুর পদবীভুক্ত। পঞ্চানন ঠাকুরের ছিল দুই পুত্র জয়রাম ও সন্তোষরাম। জয়রামের চার ছেলের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর চিৎপুর রোডের পূর্বে মোছোবাজারে জমি কিনে আলাদা বসতবাটী নির্মাণ করেন। এই মোছোবাজারই কালক্রমে পরিচিত হয় জোড়াসাঁকো নামে।

নীলমণি ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র রামমণি ঠাকুরের সন্তান ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর। উইলিয়াম কার নামে এক ইংরেজের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তিনি স্থাপন করেন কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি। ক্রমে দ্বারকানাথের হাত ধরে ঠাকুর পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধি সূচিত হয়ে চরমসীমায় পৌঁছোয়। বাঙালি অভিজাত থেকে ইংরেজ অভিজাত সমাজে সর্বপ্রই ছিল দ্বারকানাথের অবাধ গতি, প্রতিপত্তি। তিনি পরিচিত হলে 'প্রিন্স' নামে। কিন্তু তিনি যেমন আয় করতেন তেমনই করতেন ব্যয়-অপব্যয়। বাড়িতে নিয়মিত বসতো ভোজসভা ও নাচগানের আসর। প্রতিপত্তি ও অভিজাত্য বজায় রাখার জন্য সভা ও আসরে মদ ও মাংসে পরিবেশিত হত। পরিবারের গৃহদেবতা ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দন। সেখানে এইসব অনাচার করার ফলে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয়। ধর্মপরায়ণা স্ত্রী দিগম্বরী দেবী তাঁর সাক্ষ্যে সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। অবশ্য দ্বারকানাথ নিজেও সনাতন হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেননি। রামমোহন রায় তাঁর বন্ধু হলেও তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু সতীদাহ নিবারণে

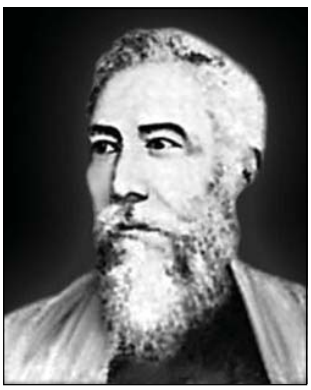

রামমোহনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবন কথা' গ্রন্থে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'তিনি সুবিধার জন্য লোকাচার মানতেন, আবার সুবিধার জন্য সাহেবিয়ানাও করতেন, কিন্তু সাহেবি পোশাক পরিচ্ছদ কখনও পরেননি।' ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর মাথার ওপর বিরাট ঋণের বোঝা।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছিল পাঁচ সন্তান-সন্ততি। এদের মধ্যে প্রথম কন্যাসন্তান ছিলেন সৌদামিনী। বাকিরা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। পিতার মৃত্যুতে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, জমিদারির সমস্ত দায়ভার এসে পড়ল জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের কাঁধে। দেবেন্দ্রনাথের শপথ—ঋণমুক্ত তিনি হবেনই। তাই জমিদারির বিষয়-আশয় বিক্রি করে তিনি পিতার বিস্তর দেনা সব শোধ করেন। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি। মিতব্যয় ও সুবুদ্ধিবলে তিনি আবার প্রচুর বিষয়সম্পত্তি গড়ে তোলেন। জমিদারির আয় ছিল বিস্তর। পিতার মৃত্যুর পর তাই প্রথম জীবনসংগ্রামের পর আর কখনও তাঁকে জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়নি। কোমলে কঠোরে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। তিনি কখনও পিছু পা হননি। পিতার অমতেই তিনি ১৮৪৬ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ নিয়ে পিতাপুত্রের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ আর পুরানো বিশ্বাসে অর্থাৎ সনাতন হিন্দুধর্মে ফেরেননি। দেবেন্দ্রনাথের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে।

আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনয়নাদি সংস্কার প্রচলিত ছিল, তাই অন্যান্য পুত্রদের উপনয়ন প্রচলিত হিন্দুরীতি মেনে হলেও ছোটো দুই ছেলে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয় ব্রাহ্মমতেই যতদূর সম্ভব অপৌত্তলিকভাবে। পূজাপার্বণ, উৎসব ইত্যাদি সমস্তকিছু বন্ধ করেছেন দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ ও উচ্চশিক্ষিত। সংস্কৃত, ইংরাজি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আকাশের নীচে বসে নক্ষত্র চেনার ও জ্যোতিষ্ক রহস্যের পাঠোদ্ধারে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি পিতার কাছেই। তিনি ছিলেন খুব সৌখিন ও রাশভারী মানুষ এবং তাঁর কাছে পান থেকে চুন খসবার জো ছিল না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'-র পাতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। তিনি লিখছেন, 'বছরকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েকদিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গমগম করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা পায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁর কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনে যাতে কোনো ত্রুটি না হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকারা, তাহার তকমা-ওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।'

যৌবনে দেবেন্দ্রনাথ খুব বিলাসী ছিলেন। কিন্তু একদিন উপনিষদের একটি ছেঁড়াপাতা হাওয়ায় উড়ে এসে তাঁর হাতে এসে পড়ে। পাতায় লেখা ছিল, 'ঈশ্বর সমস্তকে ছেয়ে আছেন, তিনি যা দেবেন তাই খুশি হয়ে নেবে, অন্যের ধনে লোভ করো না।' এই লেখা পড়ে তাঁর মন আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত এক পুরুষ। তাই তিনি প্রাচীন সনাতন হিন্দুসমাজের সংস্কার ভেঙে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ বেশিরভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকতেন বলে পুত্রকন্যাদের সঙ্গে 'অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ', 'ঘনিষ্ঠতা' হয়তো সেই অর্থে স্থাপিত হয়নি। কিন্তু পুত্রকন্যাদের ভালোমন্দের ওপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাদের লেখাপড়া, শরীরচর্চা, সঙ্গীতশিক্ষা প্রভৃতির জন্য তিনি তখনকার দিনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের বাড়িতে রেখেছিলেন। তাই আমরা পেয়েছি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে শান্তিনিকেতন-এ বিশ্বভারতী গড়ার ভাবনার মূল কারিগর দেবেন্দ্রনাথই। রবির উপনয়নের পর তাঁকে নিয়ে হিমালয় যাবার পথে দেবেন্দ্রনাথ কিছু দিন শান্তিনিকেতনে থাকেন। বোলপুর স্টেশন থেকে দেড়-দুমাইল দূরে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করে দেবেন্দ্রনাথ সেখানে একটি ছোটো একতলা বাড়ি নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন।' চারদিকে তখন ধূ ধূ প্রান্তর, একটি পুকুর। পরে দেবেন্দ্রনাথ এখানেই একটি আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশ্বকবির এই অঞ্চল পরিচয় এবং এই পরিচয়ই পরে তাঁকে এখানে বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণা জোগায়। **ক্রমশ**

# শিক্ষার যে-বন্যা বর্তমানে বইছে তার মধ্যে না আছে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, না আছে মানুষ হওয়ার প্রেরণা

**গদাধর রাণা**
**পর্ব ১**

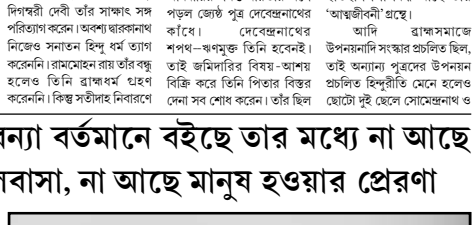

সমাজ-সভ্যতার অকৃত্রিম ধারকবাহক ও একইসাথে আধ্যাত্মিক চেতনার অনুসারী মহাপুরুষেরা যুগে যুগে জন্মে জন্মে প্রত্যাশা করেছেন—প্রতিটি মানুষই মানুষের মতো মানুষ হওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্ব স্ব জীবন পরিচালিত করুক–কিন্তু না, তা বোধ হয় আশানুরূপ হয়নি। মনে রাখা চাই, জীবিকার তাগিদে বা কেবল বাঁচার তাগিদেই এই জীবন নয়। বস্তুত জীবিকার ছায়ায় মায়ায় বেঁচে থাকাটাই বড় কথা নয়। জীবনের একটা আবশ্যিক তাগিদ আছে। জীবিকাই প্রকৃত জীবন নয় ব'লেই জীবনের একটা বড় রকমের অর্থ আছে। নানান ঘাত-প্রতিঘাত তথা প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে আত্মস্বরূপের প্রকাশের নামই জীবন। আর এক অর্থে, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে জটিল সংগ্রামই জীবন। জীবন হচ্ছে ঈশ্বরীয় সত্তার স্ফুরিত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ রবিঠাকুরের উক্তিও স্মরণযোগ্য, তিনি বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে মহৎ যা কিছু সৃষ্টি তা জীবিকার তাগিদে নয়, জীবনের প্রয়োজনে।' প্রতিটি মানুষই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ—তাই সামাজিক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই মানুষমাত্রেই তার দায় শোধ করতে সমর্থ হয়—সেই জায়গাটাতেই জীবিকার তাগিদকে ছাড়িয়ে জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনের দিকটি মূর্ত হ'য়ে উঠতে চাইবে না—কখনই সে জীবন দুঃসহ যন্ত্রণার মুখোমুখিও হবে না। তখনই তার সহিষ্ণুতার ক্ষমতা। তখনই মানুষের অসংযত কামনা আবদ্ধ হবে ন্যায়দণ্ডের বন্ধনে—তাকেই বলে 'মানবজীবনসাধনা'।

তামাম মানুষের ঐক্যপুষ্ট সংহত শক্তির-ই নাম মানবসম্পদ। এই মানবসম্পদেরই অন্যান্য প্রকৃত শিক্ষার সংগঠনের রিসিপি। বলতে কি, মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে সঠিকপ্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ করতে পারলেই কাঙ্খিত শিক্ষার বিকাশ ঘটে। অথচ, বেদনা এই –ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মিলিত শক্তিকে (man power) বোধ হয় সঠিকভাবে প্রসেসিং করা হচ্ছে না। তাই দিনে দিনে যথার্থ শিক্ষা মুখ থুবড়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সত্যস্বরূপ আলোর সমান–প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সত্যের ও সুন্দ সংস্কৃতির জৌলুসময়। সঠিক শিক্ষা অবশ্যই তার জায়গাতে আছে ঠিকই কিন্তু তা সত্য হয়েও মানুষের অজ্ঞানরূপী আবরণে ঢাকা হয়ে রয়েছে ব'লেই বিকাশের অভাবে সমাজে কেন যেন শিক্ষার অভাবটাই মূর্ত হয়ে উঠছে। যেমনটি আকাশে রাতের বেলায় সব তারাকেই দেখা যায়, দিনের বেলায় তাদেরকে দেখা যায় না। তাই বলে কি আকাশ হতে তারাদের বিলুপ্তি ঘটে? না, তা নয়, রাতের ঐসব তারারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। তেমনই, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত হৃদয়সত্তার সম্পূর্ণতার বিকাশের অভাবেই শিক্ষা অবদমিত হচ্ছে, অথচ, জন্মসূত্রেই ঈশ্বরদত্ত যে সম্পূর্ণতা, তার বিকাশ ঘটাকেই শিক্ষা বলে—একথা তো স্বামীজীই স্বয়ং বলেছেন। তাই অনাপ্লুত আবরণকে সরিয়ে শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহনের শ্রীমুখনিঃসৃত 'অপাবৃনু' শব্দটি মনে পড়ে যায়—অর্থাৎ হে সত্য! তুমি তোমার আবরণকে মুক্ত করে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠো।

এখন লক্ষ্য করতে হবে—সারাটি দেশ জুড়ে যা চলছে তাতে কী এমন মুখ্য সম্পদ আমার হারাতে চলেছি? চারদিকেই একটা অস্থিরতা, ঝগড়া, মারামারি, নির্লজ্জতা, স্বার্থপরতা। কারুরই যেন কারুর প্রতি দরদ নেই, ভালবাসা নেই; ভদ্র ব্যবহারও ক্রমাগত কমে আসছে। চরিত্রের অভাব ও মানসিক দীনতা ক্রমেই প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। যে কারণে এই অশান্ত ও ক্লান্তিকর পরিবেশ মনুষ্যসমাজে তৈরি হচ্ছে ও বেড়ে চলেছে। তার জন্য প্রধানত সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবই দায়ী– যেটি চরিত্র গড়তে সাহায্য করে এবং মানুষকে মানুষ হতে প্রেরণা দেয়। মোদ্দা কথা, চরিত্র গঠন করার শিক্ষার অভাবই আজ এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে ত্বরান্বিত করছে।

আমাদের ছেলেমেয়েরাই আমাদের মানবসম্পদ- কিন্তু বর্তমানে তারা প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে না—এ সবের জন্য তো মানুষই দায়ী। শুধুই পড়াশোনায় ডিগ্রী পাচ্ছে তারা, প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলস্বরূপ কেবলই অশিক্ষা নয়, কুশিক্ষাই সমাজকে তথা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, যে দেশে শিক্ষকদেরকেও একথা বলতে শোনা যাচ্ছে যে অনেক শিক্ষকই তাঁদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন না। বর্তমানে পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যই হচ্ছে–শুধুকী হলে কোনোমতে একটা রোজগারের জন্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া যায়। পাঠ্যের মধ্যে চরিত্রবিকাশের শিক্ষার প্রয়োজনের ব্যবস্থা থাকছে না। আত্মপ্রত্যয় ও স্বনির্ভরতার মতো গুণকে আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে সাজানোর জন্য পঠন-পাঠন, চর্চা বা পরীক্ষা নিরীক্ষার কোনোটাই হচ্ছে না। তবুও হয়ত কিছু কেমন হচ্ছে– রোজগার করে স্বীয় সংসার গোছানোর মূলে যে শিক্ষার দরকার। **ক্রমশ**

## সম্পাদক সমীপেষু

### তাঁকে আজ খুব মনে পড়ে

আমি একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। যে কোনো কাজ আমি করি। আমার দোকানে ইলেকট্রিকের কাজ নিয়ে আসেন অনেকেই। আমি অতি যত্নসহকারে কাজগুলো করে দিই। এই কাজের ফাঁকেই কানে ভেসে আসে গান। গান শুনতে শুনতে কাজগুলো করে যাই। আবার ছোটো পর্দায়ও গান গুলো দেখানো হয়। সেই গান শুনতে শুনতে মনটা ভরে ওঠে। ভাবতাম, যদি এমন একটা অনুষ্ঠান করতে পারতাম, যেখানে শুধু গানই হবে। মানুষ এসে সেই গান শুনবেন। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে ২০০০ সালে প্রথম বার একটা মাইক হাতে নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে দিলাম। দুটো বক্স লাগিয়ে গানগুলো বাজাতে বাজাতে একটা করে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতাম। বিনিময়ে একটা পেন উপহার পাবে, যদি সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন। প্রথমে ৫০ জনের মতো মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন,আমার অনুষ্ঠান শুনবেন বলে। হাওড়ার হাট অঞ্চলে সেই প্রথম বার এমন একটা অনুষ্ঠান করে মনোবল পেয়ে গেলাম। আমি ছিলেন আমার এক বন্ধু। সেই বন্ধু পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন বলেই এই অনুষ্ঠানটা করতে পেরেছিলাম। অনেক অজানা গল্প সেদিন আমার সঙ্গে বন্ধু বলেদিয়েছিলেন, যার ফলে কোনও সমস্যা হয়নি। জানি না, সেদিন মানুষ কিভাবে আমার অনুষ্ঠানটিকে নিয়েছিলেন। তবে সেই অনুষ্ঠান আমি ধারাবহিকভাবে চালিয়ে এসেছি। এখনও একজন চালিয়ে যাচ্ছেন। হাওড়াতে আমিই প্রথমবার এই মানুষটি কে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছিলাম। সে বছর ছিল শিল্পীর ৭১তম জন্মদিন। ৪ আগস্ট। আজ সেই অনুষ্ঠান অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বহু দূর থেকে মানুষ এসে এই অনুষ্ঠান শোনেন। এটাই আমার সবথেকে বড় প্রাপ্তি। একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হিসাবে ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছি। আর মানুষ গ্রহণ করেছেন আমার অনুষ্ঠান। আমার জীবনে এটা একটা বড় প্রাপ্তি। আর যাঁর প্রেরণায় এই অনুষ্ঠান, গানে গানে তিনি এলে গেছেন, 'কী উপহার সাজিয়ে দেবো, গান আছে তাই শুনিয়ে যাব।' এ কথা তাঁরই কণ্ঠে শোভা পায়। তাঁকে প্রণাম জানাই। তিনি অধিতীয় কিশোর কুমার।

**হরি সুর, চ্যাটার্জী হাট হাওড়া ৪**

### উন্নয়ন ও সমস্যা

*চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।*

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

### পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

**উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।**
সম্পাদক

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়**